ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত দক্ষিণ এশিয়া

মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান*

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ তথা সার্কভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা – ট্রানজিট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশে ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর তা করতে গিয়ে ট্রানজিটের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থান করা হয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে সার্ক অঞ্চলের (দক্ষিণ এশিয়া) দেশসমূহের বিশেষ করে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ট্রানজিটের ভূমিকা বিশে- ষণ করা হয়েছে। আর সবশেষে ট্রানজিট সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ কিভাবে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে সেবিষয়ে সুপারিশমালার আকারে আমাদের বক্তব্য উপস্থাপনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

দু'দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা হিসেবে সার্কের আবির্ভাবের। অথচ এ দীর্ঘ সময়েও এর মূল যে উদ্দেশ্য (অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও ইন্টিগ্রেশন) তার ছিটে-ফোটাও অর্জিত হয় নি। যদিও কাগজে-পত্তরে অনেক কিছু অর্জিত (সাপটা, সাফটা ইত্যাদি) হয়েছে বলে আমাদেরকে অব্যাহতভাবে জানানো হচ্ছে। বাস্তবতা কিন্তু সম্পূর্ণই ভিন্ন কথা বলছে। অদ্যাবধি দক্ষিণ এশিয়ার (সার্কের) এক দেশের মানুষ অবাধে অন্য দেশে যাতায়াত করতে পারছে না। তাদেরকে বার্লিন ওয়ালের চেয়েও কঠিন সব বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে। এক দেশের টাকা-পয়সা অন্য দেশে চলছে না। টাকা-পয়সার যাবতীয় কর্মকান্ড সাম্রাজ্যবাদী টাকা-পয়সায় (ডলার, পাউন্ড, ইউরো ইত্যাদি) করতে হচ্ছে। এক দেশের যানবাহন অন্য দেশে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। কোন কোন ক্ষেত্রে দিলেও অত্যন্ত সীমিতভাবে এবং অত্যন্ত কড়াকড়িতে। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হচ্ছে যে, প্রতিনিয়ত সীমান্ত এলাকায় গোলাগুলিতে মানুষ (সাধারণ ও আইন-শৃংখলা বাহিনীর) মারা পড়ছে। এরকম এক দুর্বিষহ অবস্থায় ফলপ্রসু আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (সার্কের প্রধান লক্ষ্য) কি আদৌ সম্ভব ? আলোচ্য প্রবন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়, রাজশাহী।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আঞ্চলিক সহযোগিতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপায় ট্রানজিটের উপর আলোকপাত করা। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

১. *ট্রানজিটের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা ;*
২. *আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ট্রানজিটের গুরুত্ব তুলে ধরা ;*
৩. *দক্ষিণ এশিয়ায় (সার্ক অঞ্চলে) ট্রানজিটের বিকাশের পথে সমস্যা ও অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করা;*
৪. *আর এ সমস্যা ও অন্তরায়সমূহ দূর করে কিভাবে ট্রানজিটের সম্ভাবনাসমূহ কাজে লাগানো যায় সেসম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ উপস্থাপন করা।*

পদ্ধতি ও তথ্য

আলোচ্য প্রবন্ধ রচনায় ব্যবহৃত তথ্য প্রধানত ঃ মাধ্যমিক উৎস থেকে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী গ্রন্থের বিভিন্ন সংখ্যা। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সংস্থা এসকাপের বিভিন্ন প্রকাশনা, বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সাময়িকী ও দৈনিকে প্রকাশিত এ সংক্রান্ত অসংখ্য নিবন্ধ ও প্রবন্ধের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

ট্রানজিট ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক

এক দেশের ভূখন্ড অন্য দেশের বা দেশসমূহের মানুষ ও যানবাহনের যাতায়াতের জন্যে ব্যবহার করতে দেয়ার নামই হচ্ছে ট্রানজিট। ট্রানজিট দু'ধরনের হতে পারে ঃ ১। আন্তঃদেশীয়, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে ; ২। একই দেশের দুই স্থানের মধ্যে। অপরদিকে করিডোর হচ্ছে কোন রাষ্ট্রের সংকীর্ণ ভূখন্ড যা অন্য রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে কোন বন্দরে যাবার পথ হিসেবে বা কোন ছিটমহলে যাবার পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বৃহৎ অর্থে করিডোর ট্রানজিটেরই অন্তর্ভূক্ত। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ ট্রানজিটের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সম্পর্ক আছে কি ? আর থাকলে তা কেমন সম্পর্ক ? অবশ্যই ট্রানজিটের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক আছে এবং তা সরাসরি সম্পর্ক ; অর্থাৎ ট্রানজিট সুবিধা থাকলে বা দিলে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। উদাহরণ হিসেবে ইউরোপের কথা বলা যায়, আসিয়ানের কথা বলা যায়, চীন-ভিয়েতনামের কথা বলা যায়, চীন-উত্তর কোরিয়া, চীন-রাশিয়া ও চীন-মঙ্গোলিয়ার কথা বলা যায়। ১৯৭৩ সালে হেলসিংকিতে স্বাক্ষরিত সর্ব ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও শান্তি চুক্তির আওতায় ইউরোপীয় দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরস্পরকে ট্রানজিট সুবিধা দিতে সম্মত হয়। এমন কি প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোও এ সুবিধা (ট্রানজিট) লাভ করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পশ্চিম ইউরোপের একমাত্র বৃটেন বাদে বাকী সব রাষ্ট্রগুলোই বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে জ্বালানী সংকটে পড়ে। ফলে তারা জ্বালানীর বিশেষ করে গ্যাসের প্রায় অফুরন্ত ভান্ডার সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইতালীসহ বেশ কিছু দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি করে গ্যাস সরবরাহের জন্যে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোতে চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে গ্যাস

সরবরাহের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ট্রান্স সাইবেরিয়ান ইন্টারকন্টিনেন্টাল গ্যাস পাইপ লাইন নির্মানের কাজ শুরু করে। প্রায় এক দশক লেগে যায় এ গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণ করতে। বিগত শতাব্দীর আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সোভিয়েত গ্যাস জার্মানী ও ফ্রান্সে পৌছে যায়। পরবর্তীতে ইতালীসহ অন্যান্য দেশে গ্যাস সরবরাহ শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর তাদের অর্থনীতির চালিকা শক্তি জ্বালানীর (গ্যাসের) জন্যে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এ ভয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা তাদের দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে পাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জাম (গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের জন্যে) সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে সোভিয়েতরা বাধ্য হয়ে নিজেরাই তা উৎপাদন করে এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করে। ইদানিং চাহিদা বৃদ্ধিজনিত কারণে জার্মানী বাল্টিক সাগরের তলদেশ দিয়ে আরও একটি সরবরাহ লাইন নির্মাণের জন্যে রাশিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ওদিকে চীন ও জাপানও রাশিয়ার সাইবেরিয়ার গ্যাস ও তেল পাইপ লাইনের মাধ্যমে পাওয়ার ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে শীঘ্রই। আসিয়ানের দেশগুলোও পরস্পরের উপর দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছে। সিংগাপুর একটি দ্বীপরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সে তার ভৌগলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে সিংগাপুর পুনঃরপ্তানী (re-export) ব্যবসা গড়ে তোলে। গড়ে তোলে অসংখ্য তেল শোধন শিল্প ও সংরক্ষণাগার। আর এভাবে পার্শ্ববর্তী মালয়েশিয়ার তেল ও রাবারসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ পুনঃরপ্তানীর মাধ্যমে সিংগাপুর দ্রুত উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় মুলধনের যোগান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছিল (৩, ৪)। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, ট্রানজিট সুবিধা একটি দেশের উন্নয়নকে দারুণভাবে প্রভাবিত করতে পারে। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দক্ষিণ এশিয়ার (সার্ক অঞ্চলের) দেশসমূহে এখনও আমাদেরকে ট্রানজিট নিয়ে বিতর্ক করতে হচ্ছে। সার্ক গঠনের পর দু'দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হলেও (১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়) এ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আস্থা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যে কারণে প্রায়ই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও তীক্ততার সৃষ্টি হচ্ছে এমন কি ছোট-খাট ও তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সাফটা (South Asian Free Trade Area বা SAFTA) চুক্তি কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে পহেলা জুলাই, ২০০৬ থেকে (পহেলা জানুয়ারী থেকে হবার কথা ছিল)। ২০১৫ সাল নাগাদ পুরোপুরি মুক্ত বানিজ্য এলাকায় পরিণত হবে দক্ষিণ এশিয়া এ সংক্রান্ত চুক্তিতে অন্ততঃ এমনটা আশা করা হয়েছে। কিন্তু ট্রানজিটের ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি না হলে মুক্ত বানিজ্যের সুফল কতটা পাওয়া যাবে সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

ট্রানজিটের ব্যাপারটি এখনও আতুর ঘরেই রয়ে গেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে পারস্পরিক অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও সহযোগিতার মনোভাবের অনুপস্থিতি। আমাদের দেশেও এক্ষেত্রে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত বিদ্যমান। যারা ট্রানজিটের পক্ষে তাদের যুক্তিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. *অর্থনৈতিক অবকাঠামোর বিকাশ বিশেষ করে রেলপথ ও নৌপথের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে ;*
২. *আঞ্চলিক বানিজ্য বৃদ্ধির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে ;*
৩. *সহায়ক অনেক সেবাখাতের বিকাশ ঘটবে ;*
৪. *অর্থনৈতিক অবকাঠামো খাতে ভারতসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে ;*
৫. *বানিজ্য ঘাটতি বিশেষ করে ভারতের সাথে আমাদের দেশের বানিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে ;*
৬. *বহুমুখী ট্রানজিট সুবিধা (বন্দর, করিডোরসহ) আমাদের দেশের জন্যে বানিজ্যের সম্ভাবনার*

নতুন দিগন্ড় উন্মোচন করে দেবে ;

৭. *বাংলাদেশের দরকষাকষির শক্তি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে ;*

৮. *সাদফ (South Asian Development Fund বা SADF) ব্যবহারের সুযোগ অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে।*

অন্যদিকে যারা ট্রানজিটের বিরুদ্ধে তাদের যুক্তিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. *জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে ;*

২. *অমীমাংসিত ঐতিহাসিক সমস্যার উপস্থিতি ;*

৩. *চীন ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা ;*

৪. *মাদক দ্রব্য পাঁচারের সমস্যা ;*

৫. *ট্রানজিট পথসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ;*

৬. *অবৈধ বানিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ;*

৭. *পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্ভাবনা।*

ট্রানজিটের পক্ষে-বিপক্ষের উপরোক্ত যুক্তি-তর্কের আলোকে প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমরা আমাদের দেশের অর্থনীতিতে এর ভূমিকা আলোচনা করবো।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ট্রানজিটের ভূমিকা

আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার আবির্ভাব ঘটে মূলতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে। তবে সবচেয়ে দেরীতে জন্ম হয় সার্কের। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সহযোগিতার উদাত্ত আহ্বানের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation বা SAARC) গঠিত হয়। বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক সনদ অনুমোদন করেন যার মূল বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. *দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ সাধন এবং তাদের জীবনমান উন্নত করা ;*

২. *অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি দ্রুততর করা ;*

৩. *যৌথভাবে আত্মনির্ভরশীল হওয়া ;*

৪. *পরস্পরের সমস্যা অনুধাবন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও বোঝাপড়ায় সাহায্য করা ;*

৫. *অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সক্রিয় সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সাহায্যের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ;*

৬. *অন্যসব উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ;*

৭. *একই স্বার্থ সংশি-ষ্ট বিষয়ে আন্ড়র্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার প্রসার ;*

৮. *অন্যসব আঞ্চলিক ও আন্ড়র্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা।*

সার্ক সনদের বিষয়বস্তুর আলোকেই নির্ধারিত হয় এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মূলনীতি যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. *দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের ১৪০ কোটি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন করা ;*
২. *সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক উন্নতির ধারা ত্বরান্বিত করা ;*
৩. *জাতীয় আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ;*
৪. *জনগণের স্বার্থে সব দেশের মধ্যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা ;*
৫. *অন্যসব আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা।*

সার্কের মূলনীতি

১. *সিদ্ধান্ত হবে সর্বসম্মত ;*
২. *দ্বিপক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয় সার্কের আলোচ্য বিষয় করা যাবে না ;*
৩. *আঞ্চলিক অখন্ডতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা ;*
৪. *সদস্য দেশের আশা-আকাংখার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভূমিকা পালন করা।*

সার্ক গঠনের পর দু'দশকেরও বেশী সময় অতিবাহিত হলেও এর অর্থনৈতিক সাফল্য প্রায় শূন্যের কোটায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আসিয়ান অনুরূপ সময়ে যে সাফল্য অর্জন করেছিল তার ধারে-কাছেও যেতে পারে নি সার্ক। অনুরূপ সময়ে তারা ভিসামুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা ও পারস্পরিক ট্রানজিট সুবিধা প্রদানসহ অনেক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল। সার্কের মত আঞ্চলিক জোট থাকতেও দক্ষিণ এশিয়ার আন্তঃবানিজ্য খুবই সীমিত (১১, ১৮ ঃ ১১ ঃ ০৫)। বর্তমানে এ অঞ্চলের সাতটি দেশের মোট বানিজ্যের মাত্র ৫.০% নিজেদের মধ্যে হচ্ছে। অথচ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, নাফটা ও আসিয়ানের ক্ষেত্রে অনুরূপ অংকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ৬৫.০%, ৫৭.০% ও ৩৭.০%। সার্কের পিছিয়ে পড়া আঞ্চলিক বানিজ্যে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের দেশ। কারণ এই স্বল্প বানিজ্যের মধ্যেও সার্কের অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে বিশাল বানিজ্য ঘাটতি বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে।ট্রানজিট সুবিধাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অবশ্যই এ ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব। আশার কথা হচ্ছে এই যে, দেরীতে হলেও গত ১ জুলাই ২০০৬ সাল থেকে সাফটা কার্যকর হয়েছে (১১, ০২ ঃ ০৭ ঃ ০৬)। উল্লেখ্য যে, সাফটা চুক্তি সই হয় সেই ১৯৯৩ সালের ১১ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত সপ্তম সার্ক সম্মেলনে। এর অধীনে সার্কভুক্ত সাতটি দেশের মধ্যে বানিজ্যের ব্যাপারে নির্ধারিত হারে শুস্ক হ্রাসের কথা আছে। এতে আঞ্চলিক বানিজ্যিক আদান-প্রদান বেড়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। সাফটা অনুযায়ী ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা তাদের আমদানী শুল্ক বাংলাদেশসহ সার্কের অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আগামী ছয় মাসের মধ্যে বর্তমান হার থেকে ১০.০% হ্রাস করবে। আর বাংলাদেশ কমাবে ২.৫%। বর্তমানে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শুল্ক হার হচ্ছে ২৫.০%। সাফটা চুক্তি অনুসারে আগামী তিন বছরের মধ্যে তা ০.০ – ৫.০% এ নামিয়ে আনতে হবে। আর এজন্য বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলো সময় পাবে দশ বছর। সংশ্লীষ্টরা অবশ্য আশংকা করছেন যে, নন-ট্যারিফ ও প্যারাট্যারিফ বলে পরিচিত শুল্ক বহির্ভূত বাধা-বিপত্তির জন্য

সাফটা থেকে ফায়দা উঠানো কঠিন হবে। অতএব, শুল্ক বহির্ভূত বাধা দূর করা না হলে মুক্ত বানিজ্য কাজে আসবে না, এমনকি শুল্ক হার শূন্য করা হলেও না।

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় দেশ হচ্ছে ভারত। গোটা অঞ্চলের প্রায় দেড় বিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে এক বিলিয়নেরও বেশী মানুষ বাস করে ভারতে। ভারতের অর্থনীতি যেমন শক্তিশালী, প্রবৃদ্ধিও তেমনি সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে (প্রায় ৮.০%)। কাজেই সাফটা কার্যকর হওয়ার একটি প্রধান বাস্তবতা হচ্ছে এ চুক্তি থেকে আমাদের দেশসহ এ অঞ্চলের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর লাভবান হওয়া। আর সেটা নির্ভর করছে বড় দেশ বা বড় বাজার ভারত এই দেশগুলোর জন্যে তার বাজার কতটা উন্মুক্ত করছে বা পণ্য প্রবেশের শুল্ক, অশুল্ক বা প্যারাশুল্ক বাধাগুলো কতটা দূর করছে তার উপর। এমতাবস্থায়, স্বাভাবিকভাবেই সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বানিজ্যের প্রথম টার্গেট হচ্ছে ভারতের বাজারে প্রবেশ করা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত এ যাবৎ তার বাজারে আমাদের দেশী পণ্য প্রবেশের সুযোগ সামান্যই দিয়েছে। অথচ শুধু আঞ্চলিক বানিজ্য চুক্তি সাফটাই নয়, দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বানিজ্য নিয়েও আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে। সার্কের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র বিশেষ করে বাংলাদেশ বানিজ্য উদারীকরণ করলেও ভারত যথাযথ বানিজ্য উদারীকরণ করেনি। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার আওতায় বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ভারতের যেসব সুবিধা প্রদানের কথা সেগুলো প্রদান করা হয় নি বলে যেমন অভিযোগ রয়েছে, তেমনি শুল্ক বহির্ভূত ও প্যারা শুল্ক বাধা আরোপের মধ্য দিয়েও বানিজ্য সুবিধা বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। কাষ্টম, ব্যাংকিং সমন্বয়, পণ্যমান নির্ধারণ এবং অবকাঠামোগত সমস্যা ও রাজ্য সরকারগুলোর পৃথক শুল্ক আরোপজনিত সমস্যাগুলো এখনও পূর্বের মতই রয়ে গেছে। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বানিজ্য ঘাটতি প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার (১)। এ ঘাটতির সবটুকুই যে ভারতের কারণে তা অবশ্যই নয়, আমাদের দেশের রপ্তানী পণ্যের সীমাবদ্ধতাও এর জন্যে অনেকাংশে দায়ী। শুল্ক বহির্ভূত নানা রকম বাধা সৃষ্টি করে ভারত বাংলাদেশের হাতেগোনা কয়েকটি পণ্যেরও প্রবেশাধিকার বন্ধ করে রেখেছে।

তবে এটাও ঠিক, মুক্ত বানিজ্যের ক্ষেত্রে পণ্যের মান এবং রুলস অফ অরিজিনের (৫) নিয়মাবলি মেনে চলার ব্যাপার রয়েছে। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা দূর করা, কাষ্টমের প্রক্রিয়াগত সমন্বয় সাধন, ব্যাংকিং প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও সমন্বয় এবং কার্যকর বীমা ব্যবস্থা একান্ত জরুরী। ঋণ পত্রের ক্ষেত্রেও এ অঞ্চলের সবার কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। পণ্যের মানের ক্ষেত্রেও সঠিক একটি সমন্বিত মান নির্ধারণ প্রক্রিয়া গ্রহণ অপরিহার্য। পণ্য আনা নেয়ার ক্ষেত্রে অব্যবস্থা দূর করা দরকার। বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতের বানিজ্যের ক্ষেত্রে উভয় দেশের স্থল বন্দরের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা ও অবকাঠামোগত দুর্বলতা দূর করা খুবই জরুরী। এছাড়াও ঘুষ, দুর্নীতি ও হয়রানীর ব্যাপার তো রয়েছেই। কিন্তু এসব সমস্যা সত্ত্বেও কাষ্টমের বাধা, জটিল সার্টিফিকেশন নিয়মাবলি এবং শুল্ক বহির্ভূত বাধাগুলো দূর করা অবশ্যই সম্ভব। এর জন্যে প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি ভারতের শুল্ক বিভাগ সাফটা চুক্তির আওতায় শুল্ক হার হ্রাসের নোটিশ দিয়েছে (১১, ০৮ ঃ ০৭ ঃ ০৬)। ৩০ জুন ২০০৬ তারিখে জারি করা এ নোটিশে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের ক্ষেত্রে অধিকতর হারে শুল্ক হ্রাসের বিধান করা হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে এ ঘোষণা বাস্তবায়নে যেন প্রাতিষ্ঠানিক বাধা প্রধান হয়ে না দাঁড়ায়ে সে ব্যাপারে ভারত সরকারকে সজাগ থাকতে হবে। আরও বড় বিষয় হলো শুল্ক বহির্ভূত বাধাগুলো দূর করার ব্যাপারে বাংলাদেশ-ভারতের

মধ্যে অব্যাহত আলোচনা বাঞ্ছনীয়। যত দ্রুত সম্ভব এ সমস্যা দূর করা দরকার, তা না হলে শুল্ক হ্রাস যেমন কোন কাজে আসবে না, তেমনি সাফটা বাস্তবায়নও সমস্যার আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকবে।

তবে সব কিছুর মূলে হচ্ছে ট্রানজিট। ট্রানজিট সুবিধা উন্মুক্ত করার সাথে সাথে যদি প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা না হয় তাহলে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হবে না। আর এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে প্রয়োজন স্থল পরিবহণ অবকাঠামো। স্থল পরিবহণ অবকাঠামো আবার দু'ধরনের ঃ রেল ও সড়ক পরিবহণ অবকাঠামো। অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে রেল পরিবহণ হচ্ছে সবচেয়ে লাভজনক। কারণ রেল হচ্ছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, দ্রুত ও সস্তা। অথচ এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সবচেয়ে পিছিয়ে আছে। বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে কোনও রেল যোগাযোগ নেই। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বছর দুই পূর্বে যাত্রীবাহী রেল যোগাযোগ শুরু হলেও তা অত্যন্ত সীমিত ও অনিয়মিত। অনেক আলাপ-আলোচনা হলেও বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অদ্যাবধি রেল যোগাযোগ শুরু করা সম্ভব হয় নি। অথচ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রেল নেটওয়ার্ক সর্বভারতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গেই সংযুক্ত ছিল। ১৯৬৫ সালের ভারত – পাকিস্তান যুদ্ধের পর বর্তমানের বাংলাদেশের সাথে ভারতের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর কিছুদিন মালবাহী ট্রেন চললেও ১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে তাও বন্ধ হয়ে যায়। সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রায় একই অবস্থা বিদ্যমান। নামকা ওয়াস্তে সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান থাকলেও মানসম্পন্ন সড়কের অভাব ও নানা রকম বিধি নিষেধের ঘেরাটোপের কারণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে এশিয়ান মহাসড়কের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ অন্যান্য দেশ এ মহাসড়কের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হলেও বাংলাদেশ হয় নি (৩১ ডিসেম্বর ২০০৫ চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে)। ইউএনএসকাপ (United Nations Economic and Social Council for Asia and the Pacific, বা UN-ESCAP) ১৯৯২ সালে অলটিড (Asian Land Transport Infrastructure Development বা ALTID) নামে এক প্রকল্প শুরু করে যার প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

১. *এশিয়ান মহাসড়ক (Asian Highway বা AH) নির্মাণের মাধ্যমে এশিয়ার দেশগুলোকে সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা ;*
২. *ট্রান্স-এশিয়ান রেল পথ (Trans-Asian Railway বা TAR) নির্মাণের মাধ্যমে এশিয় দেশগুলোকে ইউরোপের সাথে যুক্ত করা ;*
৩. *আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রবেশের জন্যে সীমান্ত পাড়াপাড়ের নিমিত্তে সীমান্ত পাড়াপাড় সুবিধা (Border Crossing Facility বা BCF) গড়ে তোলা।*

এসকাপের পরিকল্পনা অনুযায়ী এশিয় মহাসড়কের একটি শাখা ভারতের হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের বেনাপোল সীমান্ত অতিক্রম করবে এবং বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে সিলেট সীমান্ত দিয়ে ভারতের আসাম রাজ্যে ঢুকে যাবে। আর অন্যটি নেপাল ও ভারত হয়ে রাজশাহী সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে প্রথমটির সাথে বঙ্গবন্ধু সেতুর কাছাকাছি গিয়ে মিলিত হবে। তার মানে এশিয় মহাসড়কের বাংলাদেশ অংশ পরবর্তীতে চট্টগ্রাম ও মঙ্গলা বন্দরকে নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, ভারত ও চীনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত করবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ এশিয় মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত হলে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক স্বর্ণ দরজা খুলে যেতে পারে। এক হিসেবে দেখা গেছে যে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যদি স্থল পরিবহণ ও যোগাযোগ এবং ট্রানজিট সুবিধার ক্ষেত্রে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করে তাহলে ২০১৫ সাল নাগাদ আন্তঃআঞ্চলিক বানিজ্যের পরিমাণ এগারো বিলিয়ন

ডলারে গিয়ে পৌছাতে পারে (৯)। অপরদিকে রেলের সম্ভাবনা সড়ক যোগাযোগের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভারত যদি বাংলাদেশ রেলওয়েকে তার ভূখন্ড ব্যবহার করে নেপালে যেতে দেয় তাহলে প্রতি বছর আমাদের দেশ থেকে ৫০ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানী হতে পারে সেদেশে। তেমনিভাবে নেপালও বাংলাদেশে এবং আমাদের মঙ্গলা বন্দর ব্যবহার করে তার রপ্তানী ও আমদানী কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে (৭)। আর বানিজ্য ও বিনিয়োগের সরাসরি সম্পর্কের কথা বিবেচনায় নিলে এটা পরিস্কার যে, অলটিড প্রকল্পের আওতায় ট্রানজিট ও অন্যান্য সেবার ফি বাবদ বাংলাদেশ শুধু বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রাই আয় করবে না, বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগও আসবে দেশে।

হতাশার কথা এই যে, বিএনপি-জামাত জোট সরকার এশিয় মহাসড়ক সংক্রান্ত চুক্তিতে সই করে নি নিরাপত্তা ও ভারতীয়দের বেশী সুবিধা হবে এ অজুহাতে। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শুরুতেও তৎকালীন বিএনপি সরকার একই ভুল করেছিল বিনা খরচায় তথ্য মহাসরণীতে যোগদানে সম্মত না হয়ে। এসকাপের প্রস্তাবিত রুট (সিলেট হয়ে) বাদ দিয়ে টেকনাফ হয়ে মিয়ানমার রুটের পাল্টা প্রস্ত াব দিয়ে বর্তমান জোট সরকার আসলে গোটা জিনিষটাই বলা যায় ভন্ডুল করে দিয়েছে। রেলপথের অবস্থা তো একেবারেই ভঙ্গুর ও দুর্বল (৬)। স্বাধীনতার পয়ত্রিশ বছরে রেললাইনের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পেয়েছে। বন্দরগুলোর অবস্থা তো তথৈবচ। স্থল বন্দরের কোনও অবকাঠামো গড়ে ওঠেনি। সমুদ্র বন্দর দু'টোর অবস্থা ইউরোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর অবস্থাকেও হার মানায়। অতএব, আমাদের দেশের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে অর্থনীতি, রাজনীতি ও প্রযুক্তির সুসমন্বয় ঘটাতে হবে।

সুপারিশমালা

সার্ক জোটের আওতায় কোন রকম সফল অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্যে আমাদের মতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী ঃ

১. ট্রানজিটের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পারস্পরিক ট্রানজিট ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার আশা করতে পারে না। বাংলাদেশ ভারতকে তার পূর্বাঞ্চলীয় সাতটি রাজ্যের সাথে যোগাযোগের জন্যে ট্রানজিট দিলে উভয়েই লাভবান হবে। কারণ বর্তমানে ভারতকে পশ্চিম বঙ্গ থেকে ত্রিপুরা পর্যন্ত যেতে প্রায় এক হাজার ছয়শত পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। অথচ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে গেলে এ দূরত্ব মাত্র তিনশত পঞ্চাশ কিলোমিটারে এসে দাঁড়াবে। কাজেই ট্রানজিট সুবিধা পেলে ভারতের সময় ও অর্থের প্রভূত সাশ্রয় হবে এবং যোগাযোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। আর বাংলাদেশ রয়ালটি ও সেবা খাতের বিকাশের মাধ্যমে যথেষ্ট আয় করতে পারবে। করিডোর সুবিধা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুবিধা দিলে এ আয় কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। সম্প্রতি ভারত মায়ানমারের গ্যাস বাংলাদেশের উপর দিয়ে নেয়ার জন্যে তৃদেশীয় গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ তা প্রত্যাখান করেছে। আমরা মনে করি এটিও একটি ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ শুধু এ গ্যাস পাইপ লাইন থেকেই বাংলাদেশ বছরে কম পক্ষে পাঁচশত মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারতো। আর ভবিষ্যত গ্যাস নিরাপত্তার ব্যাপারটি তো রয়েছেই। মায়ানমারের প্রচুর গ্যাস আছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্যে গ্যাসের চাহিদা

অব্যাহতভাবে বাড়বে যা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দিয়ে ভবিষ্যতে মোকাবেলা করা সম্ভব নাও হতে পারে। বাংলাদেশ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ভারত ইদানিং বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের ভারতীয় ভূখন্ড দিয়ে গ্যাস পাইপ লাইন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিক জরিপ কাজ চালানোর জন্যে তারা বেলজীয় একটি কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গের মত কুনীতি নিয়ে চললে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বিশ্বের তথা এশীয় অঞ্চলের দেশগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। মনে রাখতে হবে যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ তার ভৌগলিক অবস্থানের এ সুবিধা কাজে লাগানোর সুযোগ নাও পেতে পারে। অতএব, সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখনই, এই মূহুর্তে। তা না হলে সাবমেরিণ ক্যাবল প্রকল্পের মত পস্তাতে হবে।

২. ট্রানজিট (করিডোর ও বন্দর সুবিধাসহ) প্রদানের বিনিময়ে অবশ্যই বাংলাদেশ নেপাল, ভুটান এবং ভবিষ্যতে চীনের সাথে যোগাযোগের জন্যে ভারতীয় ভূখন্ড ব্যবহারের সুবিধা চাইতেই পারে। নেপাল, ভুটান ও চীনও এ ব্যাপারে সক্রিয় হলে ভারত অবশ্যই এ দেশগুলোকে ট্রানজিট সুবিধা দিতে বাধ্য হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক দিনের শত্রুদেশ ভারত ও চীন পরস্পরের মধ্যে ব্যবসা-বানিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর পর (১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর বন্ধ হয়ে যায়) নাথু লা (সিকিম রাজ্যের) সীমান্ত খুলে দিয়েছে বিগত ০৬ ঃ ০৭ ঃ ০৬ তারিখ। উল্লেখ্য যে, এটি বিখ্যাত সিল্ক রুটের একটি অংশ। শুধু তাই নয়, চীন তিব্বতের সাথে তার অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্যে ইদানিং বিস্ময়কর এক রেল লাইন নির্মাণ করেছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক হাজার একশত বিয়াল্লিশ কিলোমিটার। বিগত ০১ ঃ ০৭ ঃ ০৬ তারিখ চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিনতাও এর উদ্বোধন করেন (১১, ০৪ ঃ ০৭ ঃ ০৬)। এটা হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু রেল লাইন। এর উচ্চতা হচ্ছে চার হাজার মিটার (চার কিলোমিটার)। যে জন্যে অক্সিজেন ঘাটতির আশংকায় এতে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই রেলওয়েকে চীনের রাষ্ট্রপতি বিশ্বের এক "বিস্ময়" বলে অভিহিত করেছেন। এর ফলে "পৃথিবীর ছাদ" বলে পরিচিত হিমালয় অঞ্চলের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। চীন সরকার ইতোমধ্যেই এই লাইন তিব্বতের রাজধানী লাসা থেকে দক্ষিণ এশিয়ার কাছাকাছি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছে। আগামী দশ বছরে চীনের সীমান্ত সংলগ্ন ষ্ট্র্যাটেজিক গুরুত্বসম্পন্ন ভাদং শহর পর্যন্ত ট্রেন লাইন পাতা হবে। ভাদং তিব্বতে কোমো ও ভারতে ভা ঢুং নামে পরিচিত। এটি লাসা থেকে ৩১৫ কিলোমিটার, ভুটানের রাজধানী থিম্পু থেকে ১০০ কিলোমিটার এবং ঢাকা থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর নেপাল তো আরই কাছে। আমরা মনে করি ভারত যেমন চীনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্যে সকল বৈরীতাকে আড়াল করে সীমান্ত খুলে দিয়েছে, সার্কের দেশ হিসেবে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকেও ভারত ট্রানজিট (করিডোর ও বন্দরসহ) সুবিধা প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে।

৩. ট্রানজিট সুবিধাকে সফলভাবে কাজে লাগাতে হলে সর্বাগ্রে দরকার আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ। বাংলাদেশের স্থল বন্দরগুলো ইউরোপের মধ্যযুগীয় অনুরূপ বন্দরের কথা মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং আধুনিক কম্পিউটার ও কনভেয়ার সিষ্টেমসহ পরিপূর্ণ এক স্থলবন্দর অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে। ভারত পারলে আমরা পারবো না কেন। ভারত বন্দর

অবকাঠামোর আধুনিকায়ন করেই যাচ্ছে। শক্তিশালী রেল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে এবং এসকাপের ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সংযুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক রেল পরিবহণ ব্যতীত ট্রানজিট থেকে তেমন একটা সুবিধা পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান অত্যন্ত দুর্বল অবস্থা নিয়ে একবিংশ শতাব্দীর পরিবহণ চ্যালেঞ্জ কিছুতেই মোকাবেলা করা যাবে না (৬)। সড়ক অবকাঠামোর ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। সড়ক পথের বিকাশ ঘটলেও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সড়কের এখনও যথেষ্ট অভাব রয়ে গেছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অবশ্যই অনতিবিলম্বে এসকাপের এশিয়ান হাইওয়ে প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না যে, এ সুযোগ হাতছাড়া করলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে একঘরে হয়ে পড়তে হতে পারে। ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও এশিয়ান হাইওয়ে থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মত ঝুঁকি বাংলাদেশ কিছুতেই নিতে পারে না। কারণ ভবিষ্যতে এর জন্যে চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

৪. সবকিছুর মূলে রয়েছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। সার্কের দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস এতটাই প্রবল যে, অর্থনৈতিক বিবেচনা এখানে একেবারেই কাজ করছে না। যে কারণে সার্কের আওতায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বেশ কিছু চুক্তি হলেও তার বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলো আদৌ আন্তরিক নয়। এছাড়া ঐতিহাসিকভাবে ভূখন্ডগত বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে (সিটমহল, জম্মু ও কাশ্মীর ইত্যাদি) যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সংকট থেকেই যাবে। অতএব, কোন রকম অর্থবহ অর্থনৈতিক (ট্রানজিটসহ) সহযোগিতা চাইলে সার্কের সদস্য দেশগুলোকে উপরোক্ত সমস্যাগুলোর বাস্তবসম্মত, দ্রুত ও ন্যায্য সমাধান অবশ্যই খুঁজে বেড় করতে হবে।

৫. ডলার সাম্রাজ্যবাদ থেকে সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে মুক্তির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। আসিয়ানের দেশগুলো কিন্তু বহু আগেই নিজেদের মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মুদ্রা বিনিময়যোগ্য করেছে। সার্ক দেশসমূহেরও উচিত এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা। বাংলাদেশী টাকাকে ডলারে রূপান্তর এবং ডলারকে আবার রূপীতে রূপান্তর-এ এক জটিল, ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। সরাসরি টাকাকে রূপীতে এবং রূপীকে টাকায় কেন রূপান্তর করা যাবে না ? এ প্রশ্নের উত্তর সার্ক দেশের নেতৃবৃন্দকে খুঁজে বেড় করতে হবে। আর তা যতদিনে সম্ভব না হবে ততদিনে ট্রানজিট ও অন্যান্য ব্যবস্থার সুফলও আশানুরূপ পাওয়া যাবে না।

উপসংহার

বিগত প্রায় তিন দশক (১৯৭৮ – ২০০৬) যাবৎ চীনের গড় প্রবৃদ্ধি ১০.০% এর উপরে অবস্থান করছে। আর সার্কের দেশগুলোর প্রবৃদ্ধি পাঁচ থেকে ছয় শতাংশের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অবশ্য ইদানিং ভারতের প্রবৃদ্ধি ৮.০% এ পৌছেছে (২০০৫ – ২০০৬)। মনে রাখতে হবে প্রবৃদ্ধি আকাশ থেকে পড়ে না। প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্যে কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয় যা শক্ত প্রবৃদ্ধির ভিত তৈরী করে। চীনারা বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। চীনের প্রতিটি পরিবার আজ এক একটা গার্মেন্টস কারখানায় তথা উৎপাদন সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। এর পেছনে অবশ্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে চীনের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। চীন আজ আধুনিক প্রযুক্তি

জ্ঞানসম্পন্ন এক বিশাল কর্মী বাহিনীর দেশে পরিনত হয়েছে। আর একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, চীন অত্যাধুনিক এবং অত্যন্ত বিশাল ও সুবিস্তৃত এক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে। চীন বর্তমানে অবকাঠামো খাতে ভারতের তুলনায় ছয় গুন বেশী বিনিয়োগ করছে। কাজেই প্রবৃদ্ধি তো বেশী হবেই। বিদেশী ও স্বদেশী বিনিয়োগ তো চীনেই যাবে বা হবে। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি যে, সার্কের দেশগুলোও যদি চীনের অভিজ্ঞতায় আলোকিত হয়ে শিক্ষা (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) ও ট্রানজিটসহ অবকাঠামোর উপর অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে যায়, তাহলে সার্কও অর্থনৈতিক জোট হিসেবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. অর্থ মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৬ ।

২. অর্থ মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫ ।

৩. Antipov V. I. : Singapore, <<Misl>>, in Russian, Moscow, 1982.

৪. Kurzanov V.N. : Industrial Development of Singapore, <<Nauka >>, in Russian, Moscow, 1978.

৫. Azad A. K. : "A Theoretical Note on the SAARC Cumulation System," বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা, পৃঃ ৫০৩-৫১১ ।

৬. খান মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ঃ "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা", ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন ঢাকায় ০৮-১০ ডিসেম্বর ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির পঞ্চদশ দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধ ।

৭. Khan M. M. H. : "Trade between Bangladesh and other SAARC Countries : Some Pertinent Issues", Presented at the Biennial Conference of the Bangladesh Economic Association Held on 08-10 December 2004 at the Engineers Institution, Dhaka.

৮. Rahmatullah M. : Asian Land Transportation Development : Its Implications for Trade and Economic growth for Bangladesh, Background Paper of C. P. D. arranged Dialogue, 04-05 January 1997, Dhaka.

৯. Rahmatullah M. : Asian Land Transportation Development : Its Implications for Trade and Economic growth for Bangladesh, from Perspective on South Asian Cooperation, Pakistan Office of the German Friedrich Ebert Stiftung (FES), Friedrich Ebert Foundation, 1994.

১০. Sdasuk G. V. : States of India, << Misl >>, in Russian, Moscow, 1981.

১১. দৈনিক সংবাদ, ঢাকা ।

১২. দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা ।

১৩. The Independent, Dhaka.